Ekhon Bhabna - Prabandho - Others - Bhangobhanger Phnaki - Gautom Ghash

এখন ভাবনা - বঙ্গভঙ্গের ফাঁকি - গৌতম ঘোষ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষ অতিক্রান্ত। বাঙালি জীবনের সংক্ষিপ্ত এই প্রতিবাদী অধ্যায়কে যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে আজ কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এই বিশ্লেষণ থেকে হয়তো প্রশ্ন উঠে আসতে পারে যে, এই আন্দোলনের ফাঁকিগুলি এমন কী ছিল যার ফলে মাঝপথে এর গতিবেগ স্তিমিত হয়ে গেল? কেন সহসা অন্তর্হিত হলো সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আবেগ? ১৯১২ - তে সাময়িকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও কেন চার দশকের মধ্যে আবার বঙ্গের স্থায়ী অঙ্গচ্ছেদ হলো? বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার কোন ফাঁক দিয়ে উন্মেষ হলো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের। কেন সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত হলো বাঙালির জনজীবন? ফাঁকি আরও আছে। সমকালীন ঘটনাগুলির ব্যবচ্ছেদ করে ইতিহাসবিদ্‌রা হয়তো একদিন স্পষ্ট করে দেবেন সেগুলি।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ঘোষিত হলেও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় নানা প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হচ্ছিল ১৯০৩ -এর ডিসেম্বর থেকে। এই প্রতিবাদী আন্দোলনের একদিকে যেমন শ্রেণী - চেতনার অভাব ছিল অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে এর সঙ্গে আদৌ সংযুক্ত করা হয়নি। এ আন্দোলন ছিল একান্তভাবেই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির। জমিদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, বুর্জোয়া - বুদ্ধি জীবী এবং ব্যাপক ছাত্র ও যুবকেরা ছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বস্তুত, কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে এই আন্দোলনকে পরিচালিত করা হয়নি। অথচ সে সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। দুই বঙ্গের বিভাজনে বাংলার কৃষি ও শিল্পের উৎপাদক অঞ্চ লগুলির বিভাজন সমগ্র জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এ কথা সেদিন বলা হয়নি দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে। একমাত্র স্বাধীনতাই পারে সকল বিভাজন রোধ করতে - শ্রমিকশ্রেণি বা কৃষক সমাজের মানুষকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা যায়নি এ বিষয়ে বস্তুত কোনো চেষ্টাই হয়নি। অথচ একই সময়ে পাঞ্জাবে লালা রাজপত রায় এবং অজিত সিং দোয়াব অঞ্চ লের কৃষক আন্দোলনকে অনায়াসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। ফলে, আতঙ্কিত বৃটিশ প্রশাসন ১৯০৭ সালের মে মাসে এই দুই জননেতাকে দ্বীপান্তরে পাঠায়। নিষিদ্ধ করা হয় পাঞ্জাবের রাজনৈতিক সভাগুলি। বঙ্গভঙ্গের উত্তাল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলেও ইংরেজদের রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার মতো অবস্থায় এই আন্দোলনকে নিয়ে যেতে পারেননি বাংলার নেতৃবৃন্দ। স্বভাবতই প্রশাসনের দ্বারা কঠিনভাবে আক্রান্ত হননি বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী জননায়কেরা।

১৯০৬-এ ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথের বাংলা বিভাগে ব্যাপক ধর্মঘট হয়। একই সময়ে ছাপাখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট, কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক ধর্মঘট, কাঁকিনাড়া, হুগলি ক্লাইভ জুটমিলের শ্রমিক ধর্মঘটগুলিকে অথবা খুলনা জেলার বাগেরহাটের নমঃশূদ্র শ্রেণির ভাগচাষীদের সংগ্রামকে ১৯০৬ - ০৭ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়নি। প্রকৃত অর্থে এরকম কোনো প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যথার্থভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন - 'আমাদের দুর্ভাগ্যই এই আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিনা।'

(সদুপায়।। আত্মশক্তি ও সমূহ।। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ।। ১২শ খণ্ড।। পৃঢ় ৮৩১

সেদিন বাঙালি জীবনে কবির এই উপলব্ধি ছিল ভীষণভাবে সত্য। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এই 'বয়কট' আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। বাংলার নেতৃবর্গের অনুরোধ সত্ত্বেও দেশের মাড়োয়ারি সম্প্রদায় এতে যোগ দেননি। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অজুহাতে শহরে বা গ্রামে কোথাও তাঁরা বিলাতি পণ্য বিক্রয় বন্ধ করেননি। এমনকি ৩০ আশ্বিন -এর 'প্রতিবাদ দিবসে' মাড়োয়ারি এবং মুসলমান সম্প্রদায় দোকান বন্ধ রাখতে সম্মত হননি। এদের মধ্যে অনেকে আবার বাঙালির আবেগকে শোষণ করে বোম্বাই, আমেদাবাদ থেকে আনা মিলের কাপড় বাজারদর অপেক্ষা অনেক চড়া দামে বিক্রি করেছে। সুলেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়, ১৯০৫ সালে নদিয়ার মেহেরপুরের কাছে মুরুটিয়ার মেলায় এসে স্বদেশিদের 'হৃদয় - বিদারক' ঘটনায় মর্মাহত হয়ে লিখেছিলেন - 'চাষীরা সেখানে বোম্বাই কাপড় চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদাররা বোম্বাই বলিয়া অসঙ্কোচে বিলাতী চালাইতেছে।' (পল্লীচিত্র, ১৯০৬)। এই দোকানদারদের মধ্যে শুধু মাড়োয়ারি নয়, বাঙালিও ছিলেন। কলকাতার বড়বাজারে মাড়োয়ারিদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে কত যুবকের কারাবাস ও অর্থদন্ড হয়েছে তার ঠিক নেই।

শুধু মাড়োয়ারি নয়, বাঙালি মুসলমান বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলন সমর্থন করেননি। ঢাকার নবাবা সলিমুল্লা প্রথমে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও পরে কার্জনের পরামর্শে এবং এক লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি এই আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা শুরু করেন। হিন্দু অথবা বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা রাজনীতিগতভাবে এই অবাঙালি ভূস্বামীকে নিষ্ক্রিয় করে তাঁকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাই করেননি। এইসব বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের পরামর্শে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ হাটে মুসলমানরা বিলাতি লবণ বিক্রি করতো।

স্বেচ্ছাসেবক বা হাটের ইজারাদাররা বিক্রিতে বাধা দিলে ঐসব বিক্রেতারা তখনই প্রশাসনের কাছে নালিশ জানাতো। ইংরেজরা তো বটেই, বাঙালি হিন্দু অথবা মুসলমান রাজকর্মচারীদের এ ব্যাপারে তৎপরতা ছিল যথেষ্ট। নালিশের সঙ্গে সঙ্গে পিকেটিংকারী অথবা হাটের মালিক জমিদারের লোকজনদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা হতো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। দুঃখের বিষয় হলো, গ্রেপ্তারের পর থেকেই পিকেটিংকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠনগতভাবে সাহায্য পেতেন না।

আন্দোলন যদি আবেগসর্বস্ব হয়, রাজনৈতিক দর্শনের অভাব থাকে, তবে সে আন্দোলনে নানারকম বিচ্যুতি ঘটে। বয়কট আন্দোলনে ব্যবসায়ীদের বিরোধিতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখা গেল ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের উপর অযথা নিপীড়ন। বস্তুত, কোনো স্তরেই বঙ্গভঙ্গ সমর্থকদের কোনো প্রণালীবদ্ধ সংগঠন ছিল না। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চ লে পিকেটিংকারীদের ওপর নেতৃত্বের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই শৃঙ্খলাহীন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যের পরিপন্থী।

> "...মফঃস্বলের হাটেবাজারে পিকেটিং উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যুবকগণ হাটে বাজারে যাইয়া বিলাতী দ্রব্য বিক্রেতাদিগকে তথা আমদানী করিতে নিষেধ করিতেন। সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করাতে তাহারা লবণ চিনি রাস্তাতে ফেলিয়া দিতে লাগিল।"

(আত্মচরিত ।।কৃষ্ণকুমার মিত্র।। পৃঃ ২৪৩ - ২৪৪)

বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী অথবা লুন্ঠন চলল। ধোপা - নাপিত দিয়ে অগ্নিসংযোগ অথবা লুন্ঠন চলল। ধোপা - নাপিত বন্ধ করে সামাজিক বয়কট করাও শুরু হলো। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা ক্রমশ হারাতে লাগলেন জনসমর্থন। রবীন্দ্রনাথ এসব আচরণ সমর্থন করেননি। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় রচিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে আন্দোলনকারীদের এই বাড়াবাড়ি তিনি চিত্রিত করেছেন।

প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। বিরোধীরা প্রতিরোধ শুরু করলেন প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে। বরিশাল, ময়মনসিং জেলায় দেখা গেছে পিকেটিংকারীদের মধ্যে কখনও কোনো মুসলমান থাকলে তার নাম জিজ্ঞেস করেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিত। অন্য দিকে একই অপরাধে হিন্দুদের কারাবাস ও জরিমানা হতো। উভয় সম্প্রদায়ের মন বিষিয়ে দেওয়ার জন্য ইংরেজদের ভেদনীতির এক অপূর্ব কৌশল। দু- একটি ক্ষেত্রে অবশ্য মুসলমানরাও শাস্তি পেয়েছে, তবে তা নিতান্তই কম। এইভাবেই বঙ্গভঙ্গের কালে সম্প্রদায়গত বিভেদ বেড়েই চলল এবং স্তিমিত হতে থাকলো আন্দোলনের গতিবেগ।

> "...বঙ্গ বিভাগের জন্য আমরা ইংরেজ - রাজের প্রতি যতই রাগ করি - না কেন, এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি - বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক - না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কি ছিল না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট - ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে - কোনোপ্রকারেই হোক্ বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গভঙ্গ বিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।"

(সদুপায়।। আত্মশক্তি ও সমূহ।। রবীন্দ্র - রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। ১২শ খন্ড।। পৃঃ ৮২৭-৮২৮)

বয়কটের একটা অন্যদিকও ছিল। অবস্থার চাপে পড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মানুষকে অধিক পয়সা ব্যয় করে বিলাতী পণ্যের পরিবর্তে দেশিয় পণ্য কিনতে হতো। এ সময়ে প্রায় শতাধিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইংলন্ড থেকে আমদানি হতো। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরও দু-একটি বড় শিল্প ছাড়া কোনো দেশীয় শিল্পের প্রসার তখনও ঘটেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলার কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং চাহিদা পূরণের সুযোগ কম থাকায় সাধারণ মানুষকে নিত্যই বিড়ম্বিত হতে হতো। ফলত, বয়কট আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি সাধারণ বাঙালির জীবনে। এই বয়কট আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশের বাইরে মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় পড়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই

আন্দোলনগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে জাতীয়রূপ দিতে পারেননি কেউ।

বিলাতি পণ্যের বর্জনের সাথে সাথে যে প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিল তা'হলো দেশীয় পণ্যের উৎপাদন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উজ্জীবিত বাঙালি আবার একটি ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করলেন বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাতে গিয়ে। অর্থনীতির একজন সাধারণ ছাত্রও জানেন যে, নতুন শিল্পের প্রসার ঘটাতে চাই পরিকাঠামো, মূলধন, কাঁচামালের সহজ সরবরাহ, দক্ষ কারিগর, প্রযুক্তি এবং বিক্রয়যোগ্য বাজার। এসব শর্তের কোনোটিও না মেনে আবেগ এবং সীমিত মূলধন নিয়ে উৎপাদনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল ঘরে ঘরে। আবেগ কতখানি কাজ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন স্ত্রীর গয়না বেচে কবি কুরুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় দেশলাই -এর কারখানা খুললেন।

'একটা কিছু করতে হবে' এই মনোভাব নিয়ে কবি সাহিত্যিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার সবাই স্বীয় অর্থ ব্যয় করে ব্যবসা শুরু করলেন। এইসব উদ্যোক্তারা স্ব স্ব পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ব্যাবসার অভিজ্ঞতা কারও ছিল না। ডাঃ নীলরতন সরকার 'ক্রোম' চামড়ার কারখানা খুললেন। তিনি আরও একটি কারখানা খুললেন 'ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি'। ব্যাঙের ছাতার মতো পরিকল্পনাহীন কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকলো বাংলাদেশ জুড়ে। ব্রিটিশ পণ্যের সাথে এক অসম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে স্তাপিত হলো বহুসংখ্যক স্টিল ট্র্যাঙ্ক তৈরির কারখানা, তৈরি হলো সাবান এবং দেশলাই তৈরির বহু কারখানা। সন্তোষের জমিদার প্রথমনাথ রায়চৌধুরী 'ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টারি', রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কালী ঘোষ পেন্সিল এবং দেশলাই - এর কারখানা স্থাপন করলেন। শান্তিপ্রিয় গুপ্ত, এফ. এন. গুপ্ত পেন্সিলের কারখানা খুললেন। এইসব কারখানা উৎপাদিত পণ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত নিম্নমানের ছিল যে বাজারে তার যথেষ্ট কাটতি ছিল না। ফলত, মূলধন নিঃশেষ হলো দ্রুত, ব্যবসাও গেল উঠে।

১৯০২-১৯০৩ সালের আমদানি তালিকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ছিল বই, ঘরি, নানারকম শস্য, ডাল, দেশলাই চিনামাটির বাসন, চা, খেলনা, কাগজ, চিনি, ছাতা এবং ফলমূল ও শাক পর্যন্ত। ভারি শিল্পজাত পণ্যের কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং অপরিকল্পিত শিল্প স্থাপন হঠকারিতাই ছিল সে সময়। যে সব শিল্পের সম্ভাবনা ছিল সেগুলিও আত্মকলহ এবং অসদাচরণের জন্য নষ্ট হয়ে থাকে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু গুহ, উপেন্দ্রনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তি বাংলার বস্ত্রের অভাব দূর করার জন্য স্থাপন করলেন 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল'। এদের তৈরি মোটা কাপড় অ্যান্টি - সার্কুলার সোসাইটির সদস্যরা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে উৎসাহের অভাব দেখা দিল। এর ফলে বিক্রি কমতে থাকে এবং একসময় 'বঙ্গলক্ষ্মী' বন্ধ হয়ে যায়। পরে টাঙ্গাইলের নাগরপুরের রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী এই কটন মিলের ঋণভার নিজের কাঁধে নেওয়া এটি অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলওয়ালারা বাংলাদেশকে শোষণ করে লক্ষপতি হয়ে ওঠে।

জাতীয় ব্যঙ্ক না থাকলে দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রাজা জানকীনাথ রায় প্রভৃতির চেষ্টায় 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যঙ্ক' স্থাপিত হয়েছিল। কিছু 'স্বার্থপর' লোকের হাতে এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার দায়িত্ব পড়লে ব্যাঙ্কটি উঠে যায় আনন্দমোহন বসুও বাঙালি জাতির দারিদ্র্য দূর করার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শ্বশুর, জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর এই ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছিলেন। তাঁর পরে চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা ভুবনমোহন দাশ যখন এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব নেন তখন কিছু ব্যক্তির প্রতারণায় ব্যাঙ্কটি উঠে যায়। বঙ্গভঙ্গের কালে বাঙালির প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যাঙ্কের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে।

৩০ আশ্বিন 'বঙ্গভঙ্গ দিবস' -এর সভায় ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল। পরে কুমার মন্মথনাথ মিত্র আরও অনেকে খালি পায়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আরো ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। বাংলার নেতৃবর্গ জনসাধারণের অর্থ নিয়ে উন্নতির নামে যে শিশুসুলভ কর্মসূচি নিয়েছিলেন তা'হলো বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিত' - চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"এই টাকা দ্বারা কার্য আরম্ভ হইল। ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সঙ্গীত সমাজ গৃহে এক সভা করিয়া স্থির হইল, সংগৃহীত টাকা দ্বারা সঙ্গীত সমাজের ভবনে চরকায় সূতা কাটা ও তাঁতে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ তারকনাথ পালিত প্রভৃতি এই কার্যে পরমোৎসাহে যোগদান করিলেন। তৎকালে চরকা পাওয়া যাইত না। অবিলম্বে প্রায় ৪০০ শতক চরকা প্রস্তুত করা হইল। বহুসংখ্যক ঠক্‌ঠকি তাঁত ও কয়েকটা হ্যাটার্সলি তাঁত ক্রয় করা হইল। প্রায় ৪০০ শত ভদ্র বংশের যুবক চরকায় সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন শিক্ষার জন্য এই বয়ন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। ছাত্রদের প্রাণে এই আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল যে চরকায় সূতা কাটিয়া ও তাঁতে বস্ত্র বুনিয়া তাহারা প্রতিদিন অন্যূন ২/৩ টাকা উপার্জন করিতে পারিবে এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস করিতে পারিবে।

চারমাস পরীক্ষার পর দেখা গেল, চরকায় সূতা কাটিয়া কেহই প্রতিদিন ৯ আনার বেশি উপার্জন করিতে পারে না। তাহারা যে সূতা কাটিয়াছিল সে অসমান সূতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। যাহারা বস্ত্র বয়নে সুদক্ষ হইয়াছিল তাহারও প্রতিদিন ১১ আনার বেশি উপার্জন করিতে পারিত না। সুতরাং চারি পাঁচমাস পরেই সমস্ত ছাত্র চলিয়া গেল। চরকা ও তাঁত পড়িয়া রহিল। ইহার পর গালিচা বুননের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও লাভজনক হইত্ব না। সুতরাং বয়ন বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল। এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৩০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। চাকার ওপর তাঁত বিক্রয় করিযা চারি - পাঁচশত টাকার বেশী পাওয়া যায় নাই।" (পৃঃ ২৫৮ - ২৫৯) অবশ্য সবটাই ফাঁকি বলে ইতিহাসকে হয়তো বিকৃত করা হবে। যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় সুবোধচন্দ্র রায়, বনোয়ারীলাল চৌধুরীর মতো কিছু মানুষ, যাঁরা ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিশীল, তাঁরা সমস্যার প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করতে পেরেচিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চাই প্রযুক্তি এবং কারিগরি দক্ষতা। তাই কিছু উদ্যোগী যুবককে চাঁদা তুলে সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তির জ্ঞান আহরণ করতে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের পাঠানো হয়েছিল পোর্সিলেন, মোমবাতি, চিরুনি তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে। এঁদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রমোহন বসু তাঁর 'ওয়াটার প্রুফ' সামগ্রী তৈরির শিল্পকে দীর্ঘজীবী করতে পেরেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান - প্রযুক্তি - শিল্প বিকাশের জন্য নিরলস সাহায্য করেছিন। তাঁদের স্বদেশি ভাবনা কেবলমাত্র বঙ্গভঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতীয় নেতৃত্ব শিল্পের প্রসারে এইসব বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেননি। তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি শিল্পপতিরা স্বদেশি শিল্পের প্রসারে তেমন উদ্যোগও নেননি, আন্দোলনের ফাঁকটা ছিল এখানেও।

আন্দোলনের বৈচিত্র ছিল, প্রসার ছিল, জনসমর্থনও ছিল কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধে যে ফাঁকি ছিল তা'হলো হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব বৃদ্ধি। সমাজের দুই সম্প্রদায়ের এই দূরত্ব সামন্ত যুগ থেকেই ছিল। বর্ণহিন্দু এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণির দ্বারা সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের মানুষ নিয়মিত নিপীড়িত হতো। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত অন্ত্যজ হিন্দুরা আন্তরিকভাবে বর্ণহিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পরে এইসব নির্যাতিত মানুষ সামাজিক মুক্তির পথ খুঁজে পেতে ধর্মান্তরিত হল। এই নবীন ধর্মের উদারতার এবং ধর্মীয় শৃঙ্খলার কারণে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নিবিড়তর হয়। দূরত্ব বাড়তে থাকে পর সম্প্রদায়ের থেকে।

> "হিন্দু ও মুসলমান যে বাংলাদেশের বরাবরই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায় ছিল, ধর্ম ও সামাজিক আচার - ব্যবহার সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ তো দূরের কথা কোন নিবিড় যোগসূত্র গড়িয়া ওঠে নাই, একথা অস্বীকার করা কঠিন তাহারা প্রতি গ্রামে ও শহরে বা পাশাপাশি গ্রামে এক সঙ্গে বাস করিত। কিন্তু তাহারা এক পরিবার বা সমাজভূক্ত হয় নই"
>
> "...তাহাদের মধ্যে সচরাচর বৈরীভাব ছিল না কিন্তু ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কোন প্রমাণ নাই। হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন থাকিলেও সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সর্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ এত গুরুতর ছিল যে ইহার কোন সম্ভাবনাও কেহ মনে করিত এরূপ প্রমাণ নাই।"

(বাংলাদেশের ইতিহাস ।। ৩য় খণ্ড ।। রমেশচন্দ্র মজুমদার ।। ১ম সং. ।। পৃঃ ১১৬ - ১১৭)

বঙ্গভঙ্গের সময় সম্প্রদায়গত বিরোধ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বাঙালি মুসলমানরা যে বাঙালি হিন্দুদের থেকে অনেক দূরে একথা যথার্থভাবে বুঝেছিল ইংরেজরা। ফলে রাজনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে তারা ভেদনীতির আশ্রয় নিল। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হত পরিণামে।

আন্দোলনের গোড়ার দিকে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মুন্সী দেদার বক্স, আবুল হোসেন, ডাক্তার আব্দুল গফুর, সিরাজগঞ্জের ইসমাইল সিরাজী, টাঙ্গাইলের ওয়াজের আলি খাঁ মানি, আব্দুল রসুল প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও তাঁদের অনুগামীগণ বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। এমনকি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাও প্রথমে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বঙ্গভঙ্গের সূচনাতে হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও একই ভাবাবেগ কাজ করেছিল। আন্দোলনের সময়ে যারা পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য

১৯০৬ - এর ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রান্ড থিয়েটারে, একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক দু'দিন পরে মুসলিম নেতৃবর্গ একই উদ্দেশ্যে অ্যালবার্ট হলে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। সেদিন প্রচন্ড দুর্যোগ সত্ত্বেও বহুলোক সেই সভায় সমবেত হয়েছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে মুন্সী দেদার বক্স বলেন -"দেশের কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে যাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছিল - তাঁদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই এটি গভীর পরিতাপের বিষয়।" এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হিন্দু - মুসলমান সমবেত হয়ে ভবানীপুরে একটি সভা করেন।

আন্তরিকতার অভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তার অনেক আগে থেকেই বহু শিক্ষিত মুসলমান জাতীয় রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্য। 'হিন্দু মেলা', 'গণপতি উৎসব' প্রভৃতি সংগঠন বা কর্মসূচি, বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু রচনায় অথবা রঙ্গমঞ্চে র নাটকে মুসলমানদের হেয় বা অবজ্ঞা করার চেষ্টা, শত্রু হিসেবে তাদের চিহ্নিত করার প্রবণতায় রীতিমতো আহত হচ্ছিলেন শিক্ষিত মুসলমানরা। ক্রমশ সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। ১৯০৬ সালের জুন মাসে কলকাতায় তিলকের উপস্থিতিতে 'শিবাজী উৎসব' হয়। অনুষ্ঠানে হিন্দু রঙ থাকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যরা এতে যোগ দেননি, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের তো প্রশ্ন ওঠে না। সাধারণ হিন্দু সমাজ যথেষ্ট উদারতার সঙ্গে আপন করে নিতে পারেনি মুসলমানদের। সামাজিক ও মানসিক দূরত্ব রয়ে গিয়েছিল একই জায়গায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে দ্বান্দ্বিক বিকাশের আমোঘ নিয়মে শুরু হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী তথা জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এটি ছিল একপেশে এবং মুসলিম সমাজের কারও প্রবেশাধিকার ছিল না এই আন্দোলনে।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে মুসলিম সমাজের নেতাদের দায়ও কম ছিল না এতটুকু। ইংরেজদের ভেদনীতির ফাঁদে তাঁরা পা দিয়েছেন সহজে। ১৯০৬ -এর ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যই আইন সভার সদস্যপদ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরি ইত্যাদি সংরক্ষণের দাবি পেশ করেন। বস্তুত, ইংরাজরাই এসব দাবি পেশ করানোর জন্য মুসলিম নেতৃবর্গকে প্রলুব্ধ করেন। এই দাবি সনদ পেয়ে মুসলিমদের প্রতি ইংরাজ সরকার সহানভূতিশীল হয়ে ওঠে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি র জন্য তারা মুসলিম তোষণ শুরু করে। এর ফলশ্রুতি হিশাবে ঐ বছরের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সল্লিমুল্লার উদ্যোগে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। শুরু হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনীতি। সৃষ্টি হয় জাতিগত বৈষম্যের। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল আরও অনেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়মূল করে ব্যবধান করার জন্য প্রচুর লেখালেখি করেন। অনেক মুসলিম কাগজেও একই কথা বলা হয়েছে বিভেদ কমানোর জন্য। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে যাচ্ছিল শব্দহীন ব্যস্ততায়। জীবনের অঙ্গনে বিভেদের পাঁচিল ভাঙার চেষ্টা করা হয়নি কখনও। আন্দোলনের তীব্রতা সত্ত্বেও ফাঁক ও ফাঁকি দুই বজায় ছিল যথারীতি।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতায় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাত্মক সমর্থন ছিল না। বাংলার বাইরের অন্যান্য প্রদেশের বহু জাতীয় নেতা এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন হিশেবে গুরুত্ব দিতে চাননি। প্রাদেশিকতার উর্ধে আমরা সবাই যে ভারতবাসী এই স্বাজাত্যবোধের অভাব ছিল বলেই বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর যখন সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে গণ - আন্দোলন শুরু হল তখন পন্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন- "বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। ইহাতে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।" কাশীর কংগ্রেসে যখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন মালব্য এবং অন্য কিছু প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা বলেন, "প্রাদেশিক ব্যাপার কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়।" পরে কাশী কংগ্রেসের সভাপতি গোখেলের চেষ্টায় অন্য প্রদেশের লোকেরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম দুর্বলতা হলো যে নেতৃবর্গ দেশের ছাত্র সমাজের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তুলতে পারেননি। শিক্ষা আন্দোলনে নেতাদের পশ্চাদপসরণ এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে বিলম্বই ছাত্রদের হতাশার কারণ। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নানা কারণে ছাত্রদের ক্ষোভ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নানা কারণে ছাত্রদের ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। ১৯০৫ - এর ১২ অক্টোবর কার্লাইল সার্কুলার ঘোষিত হলে ছাত্রদের ক্ষোভ ফেটে পড়ে। তিন সপ্তাহ পরে ৪ নভেম্বর এই সার্কুলারের কপি ছিঁড়ে তৈরি হলো 'অ্যান্টি - সার্কুলার সোসাইটি'। ১১ নভেম্বর গোলদিঘিতে জমায়েত হলো দশ হাজার ছাত্র। ছাত্ররা রাজনীতি করলে অথবা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিলে স্কুল কলেজ থেকে বহিস্কৃত হবে। দলে দলে ছাত্র 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। অথচ এদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হলো না। কিছু কিছু নেতারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু - একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। হাজার হাজার বহিস্কৃত ছাত্রের তুলনায় সে আয়োজন নিতান্ত নগণ্য। সিটি বা রিপন প্রভৃতি ব্যক্তিগত কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিরোধ এড়াতে বহিস্কৃত ছাত্রদের কোনো সাহায্যই করলো না। হতাশাগ্রস্ত ছাত্রদের অনেকেই সকল আন্দোলন বিসর্জন দিয়ে আবার ফিরে যায় 'ইংরেজের গোলামখানায়।'

> "মফস্বলের ছাত্ররা প্রচন্ড রকম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল কারণ তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করে বেরিয়ে এসেছে অথবা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভ অনুরণিত হচ্ছিল রংপুরের সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, মাদরীপুরের বিতাড়িত প্রধানশিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের বক্তৃতায়"।

(জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।। ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়।। বজ্রশিখরে বাংলা গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ।। পৃঃ ১৩০ - ১৩১)

একবছর পরে ১৯০৬ সালের ১১ নভেম্বর, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন হয়। 'ফিরে পাওয়া' ছাত্ররা আর জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেননি। এমনিক অন্য কোনো আন্দোলনেও যোগ দেননি।

বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে নরমপন্থীদের আপোষ এবং হতাশা, চরমপন্থীদের মতো বিভিন্নতা এবং অন্যদিকে নানাভাবে ইংরেজদের অত্যাচার জর্জরিত হয়ে দেশের যুব সম্প্রদায়ের বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটে। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধে র পথ পরিত্যাগ করে তাঁরা গ্রহণ করলেন জনসাধারণের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিহত্যার সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পথ। এইভাবে গণ আন্দোলন থেকে শুরু হলো উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গের সুযোগে ধর্মান্ধ মৌলবী মোল্লাদের সুবিধা হয় পূর্ববঙ্গকে তাদের নিজস্ব প্রদেশ বলে প্রচার করতে। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ মদতে পূর্ববঙ্গ মোট আধিবাসীর দুই - তৃতীয়াংশ মুসলমান কৃষককের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতাকে মূলধন করে এই প্রচার তীব্রতর করা সম্ভব হয়। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ সাময়িকভাবে রসদ হলেও সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয়নি। এবং এই কারণেই চার দশক পরে ধর্মের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্ভব হয়।

সকল রকম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথে শ্রেণি সংগ্রামকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া কোনো ভাবনা জাতীয় নেতাদের না থাকায় এই আন্দোলনের তীব্রতা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। জাতীয় নেতাদের সীমাবদ্ধ তা একটি সম্ভাবনাকে সেদিন অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিয়েছিল।